লুম্পেনকথা

মইদুল ইসলাম

রাজ্যের বর্তমান শাসক দল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কয়েকটি নতুন উপাদান যোগ করেছে। রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের রাজনৈতিক চরিত্র বুঝতে গেলে শুধু কংগ্রেস বা বিজেপি-র সঙ্গে সময় বুঝে সুবিধাবাদি রাজনৈতিক অবস্থানকে পর্যালোচনা করলে হবে না। একইসঙ্গে তাদের রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত্তি এবং তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বকেও বোঝা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস থেকে উদ্ভূত এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি যাদের মূল জনভিত্তি হল লুম্পেন শ্রেণি। বাকি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিগুলো (শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি) ওই দলকে সবসময় সমর্থন করেননি। এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে শাসক দলের উপরের সারির নেতৃত্ব প্রায় পুরোটাই কলকাতা শহরকেন্দ্রিক এবং অনেকেই পাড়ার ক্লাব রাজনীতি বা দাদাগিরি গোছের বাহুবলী রাজনীতি করে এসেছে। তাদের গ্রামে রাজনীতি করার অভিজ্ঞতা কম। কয়েক বছর আগে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তারা প্রথমবার গ্রামে একটা বড়ো জনসমর্থন খুঁজে পেয়েছিল। সেই জনসমর্থনকে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু একদিকে জনগণের করে পুষ্ট সরকারি টাকা ও অন্যদিকে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে লুম্পেন শ্রেণির তোলাবাজির টাকার ভাগ নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

শাসক দলের সঙ্গে চিটফান্ডের মূল পাণ্ডাদের সরাসরি যোগাযোগ, আর্থিক লেনদেন এবং প্রতারক সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার গুরুতর অভিযোগ এখন সবাই জানে। এহেন অপকর্ম ও আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে শাসক দলের মন্ত্রী এবং সাংসদ কারাগারে দিন অতিবাহিত করছে। সেই মন্ত্রী জেলে থেকেও প্রায় এক বছর দিব্যি মন্ত্রী ছিলেন। কয়েক মাস আগে অবধি তিনি মন্ত্রীত্ব হারাননি। শুধু এক্ষেত্রে গল্পটা উলটো। ভরত গেছে বনবাসে আর তার প্রভু রাম, ভরতের দুটো পাদুকা দেখিয়ে আমলা দিয়ে পরিবহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতর চালাচ্ছিলেন। বাংলার মানুষ এমনই হতভাগ্য। লজ্জার মাথা খেয়ে, কয়েক মাস আগে কলকাতায়, 'তোমার আসন শুন্য আজি, হে বির পূর্ণ করো' মার্কা পোস্টার পড়েছিল 'ক্রীড়ামোদী, টেক্সী ও স্বাস্থ্যকর্মী দরদী' পরিবহণ মন্ত্রীকে নিয়ে। এখন রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী তথা সারদা প্রতারক সংস্থা মামলায় জেলে থাকা বিধায়ক আবার কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শাসক দলের প্রার্থী হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর আগে এরকম কোনো নজির নেই। সম্প্রতি আদালতে শাসক দলের এক বিধায়ক লোহা চুরির দায়েও দোষী বলে প্রমাণিত হয়েছে। একথা এখন অনেকটাই স্বতসিদ্ধ যে প্রতারক সংস্থার ফাঁদে পা দেওয়া গরিব সর্বহারা মানুষের টাকা লুট করা লুম্পেন পুঁজি এবং তোলাবাজি করা লুম্পেন প্রলেতারিয়াত রাজ্যের শাসক দলের পিছনে সবথেকে ধারাবাহিক সামাজিক ভিত্তি। যদিও শাসক দলে ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিছু অধ্যাপক ও শিল্পী আছেন যাঁরা অনেকে সাংসদ বা রাজ্যের মন্ত্রী, কিন্তু তাঁদের কথায় শাসক দল চলে না। লুম্পেন শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী শাসকদলের নেতৃত্ব খুব ভালো করেই জানে যে পঞ্চায়েত অথবা পুরসভায় যদি লুম্পেন রাজনীতিকদের বাড়াবাড়ি করতে দিয়ে জয় সুনিশ্চিত করতে না পারা যায় তাহলে বিধানসভা বা লোকসভার মতো বড়ো নির্বাচনে ওই লুম্পেন বাহিনীদের নির্বাচনি কাজে লাগানো যাবে না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই রাজ্যে বামেদের বরাবর শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে জনসমর্থন আছে যদিও সেই জনভিত্তি ২০০৬ সালের পর থেকে অনেকটা ক্ষীণ। কংগ্রেসের পিছনে মধ্যবঙ্গে কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের একটা তাৎপর্যপূর্ণ সমর্থন আছে। ভারতের রাজনীতি যারা চর্চা করেন তাঁরা বিজেপিকে সামাজিকভাবে রক্ষণশীল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে একটা 'বানিয়া পার্টি' বলে চিহ্নিত করেন। এই রাজ্যেও বিজেপির সবথেকে স্থায়ী জনসমর্থন অবাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের উপরের সারির অনেক নেতা নেত্রীদের রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছিল সত্তরের দশকের সঞ্জয় গান্ধীর লম্ফঝম্প করা নব কংগ্রেসের আমলে। ভারতের রাজনীতিতে বড়ো ধরনের লুম্পেনিকরণের প্রবণতা সেইসময় থেকে দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে বাম ও প্রায় পাঁচ বছরের তৃণমূল আমলে শিল্পক্ষেত্রে, ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকের তুলনায় অন্যান্য রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমে পিছিয়ে পড়ার ফলে এই লুম্পেন শ্রেণির সংখ্যা বাড়তে থাকে। লুম্পেনদের সংখ্যাবৃদ্ধির মূল কারণ হল সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের অভাব। পুঁজিবাদ এমনিতেই অসমভাবে বিকশিত হয়। আবার যেখানে সে বিকশিত হয়, সেখানে সকল মানুষকেই যে ভদ্রস্থ কোনো কাজের সুযোগ করে দিতে পারবে, এমন গ্যারান্টি নেই। বরং আজ কর্পোরেট পুঁজি উচ্চ প্রযুক্তির সাহায্যে এমন কিছু ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে যেখানে খুব উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক ছাড়া বিশেষ কেউ কাজ পায় না। অন্যদিকে ধননিবিড় (Capital intensive) শিল্প বা কারখানাকে কেন্দ্র করে যে পরিসেবাক্ষেত্রটি তৈরি হয় সেখানেও আমাদের মতো একটা শ্রমিক উদ্বৃত্ত দেশে অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকদের সংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। অর্থাৎ ধননিবিড় আর্থিক উন্নয়নের দাপটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান অনেক সময় সঙ্কুচিত হয়। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে, ধ্রুপদি পুঁজিবাদের দেশগুলোয় তো বটেই, আমাদের মতো উত্তর-ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী দেশেও একটা বড়ো আকারের সংরক্ষিত শ্রমিক সৈন্য (large reserve army of labour) থাকে। এই বড়ো ধরনের সংরক্ষিত শ্রমিক সৈন্যের মধ্যে বেকার (unempolyed), আধা বেকার (underemployed) ও ছদ্ম বেকার (disguised unemployed) থাকে।

বহু আধা বেকার ও ছদ্ম বেকারেরা আবার অসংগঠিত ক্ষেত্র ও কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু সবাই বেকার হয়ে দিনযাপন করে না, অথবা অসংগঠিত ক্ষেত্র ও কৃষিক্ষেত্রে পরিশ্রম করে না। চটজলদি অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন সস্তা, ঠকবাজি ও হিংসাত্মক রাস্তা ধরে এক প্রকারের লুম্পেন গোষ্ঠী তৈরি হয়। এই গোষ্ঠীকে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে খুব পরিষ্কার করে একটা বিশেষ 'শ্রেণি' বলা যায় না। কারণ উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সরাসরি কোনো যোগ নেই ঠিক, বিভিন্ন প্রকারের পুঁজিপতি এবং কায়িক ও বৌদ্ধিক শ্রমিকদের যেমন যোগ থাকে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মতো সমাজের এই লুম্পেন অংশ তাই বিভিন্ন ধরনের বেআইনি ও অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যেহেতু এই লুম্পেনরা আইন-কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তাই পুলিশ এবং আইন রক্ষাকারী যেকোনো সংস্থার সঙ্গে তাদের স্বভাবতই বিরোধ থাকে। একথা তাই ভুলে গেলে চলবে না যে রাজ্যে 'পরিবর্তনের' পরে লাগামহীন হারে এই লুম্পেন শ্রেণির হাতে পুলিশ বার বার আক্রান্ত হচ্ছে। রাজ্যের শাসক দল অনেক সময় নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে আদালতকে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। বহু সময় তারা সাংবিধানিক রীতি নীতি মানছে না আর আইনের শাসনের পরিবর্তে নৈরাজ্য কায়েম হচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে শাসক দলের 'সম্পদরা' মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণির (শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক ইত্যাদির) উপর আগ্রাসী আক্রমণ নামিয়ে আনছে। একথা বললে প্রায় অত্যুক্তি হবে না যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকদল হল উচ্চবর্ণীয় মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণির বিরুদ্ধে লুম্পেন শ্রেণিবিদ্রোহ।

এই লুম্পেন গোষ্ঠী ১৯৭০-এর দশকে কংগ্রেস জমানায় ও পরবর্তীকালে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের বাম আমলে ভদ্রলোক রাজনীতিকদের হাতে চালিত হত। এই লুম্পেন গোষ্ঠী এখন আর ভদ্র রাজনীতিকদের হয়ে নির্বাচনে খাটে না। এই লুম্পেন গোষ্ঠী এখন সাবলম্বী হয়ে নিজেই রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। লুম্পেনরা এখন নিজেই বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছে। অন্যদিকে চাকরি ও কাজের রাজনীতিই একটা নতুন পেশা হয়ে গেছে। এখন রাজনীতি এমন একটা পয়সা উপার্জন করার পেশা যে লুম্পেনগোষ্ঠী সেই প্রলোভনকে কোনোমতেই উপেক্ষা করতে পারে না। এহেন সন্ধিক্ষণে পশ্চিমবঙ্গে আবাসন শিল্পের রমরমা এবং তার সঙ্গে যুক্ত 'সিন্ডিকেটরাজ', 'লুম্পেনরাজ' এবং 'তোলারাজ' এখন বঙ্গীয় রাজনীতির নতুন বৈশিষ্ট ও লক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাই যেকোনো নির্বাচনে যেনতেন প্রকারণে জয় দরকার কারণ একটি ভোটে জয়-পরাজয় লক্ষ কোটি টাকার হিসেব-নিকেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই লুম্পেন রাজনীতিক সাধারণ ভোটারের উপর আস্থা রাখার ঝুঁকি নিতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে 'মাওবাদী'কায়দায় পুলিশকে বোমা মারার হুমকি দেওয়া সত্বেও শাসকদলের 'ভালো সংগঠক' বহাল তবিয়েতে শুধু ঘুরেই বেড়ায় না বরং বিরোধীদের আরো হিংস্র হুঁশিয়ারি দেয়। এহেন লুম্পেন ভাষা ও আস্ফালিত হুমকি শাসক দলের অনেক সাংসদ, মন্ত্রী এবং বিধায়কের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে যা সংবাদমাধ্যম 'ভাষা-সন্ত্রাস' বলে অভিহিত করছে। প্রতিযোগিতায় পড়ে এই লুম্পেন 'ভাষা-সন্ত্রাস' অনেক সময় বিরোধী নেতাদেরও গ্রাস করেছে। এমতাবস্থায় পুলিশের বিরুদ্ধে যখন শাসক দলের 'দলদাসে' পর্যবসিত হওয়ার অভিযোগ উঠছে তখন রাজ্যের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। পুলিশ যখন নিরপেক্ষ আচরণ করে না, তখন লুম্পেনদের মতোই ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষ যে পুলিশকে মানবে না তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে? সেরকম ভয়ানক অবস্থা কিন্তু গোটা সমাজকেই লুম্পেনিকরণ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই

লুম্পেনিকরণকে একমাত্র গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মানুষ, গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষ একজোট হয়ে রুখতে পারেন।

কিন্তু লুম্পেনদের নিয়ে প্রগতিশীলদের গম্ভীর ও গভীর ভাবনার প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ আমাদের মতো একটা উত্তর-ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী দেশে এই লুম্পেনদের সংখ্যা বহুদিন ধরে বেড়েই চলেছে এবং সংসদীয় রাজনীতিতে তারা শুধু ভোটার হয়ে থাকে না বরং বর্তমান রাজনীতির এক অন্যতম চালিকা শক্তি হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। ধ্রুপদি মার্কসবাদী সাহিত্যে এই লুম্পেন অংশ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দুর্বল। মার্কস ও এঙ্গেলস *দ্য ম্যানিফেস্টো অফ দ্য কমিউনিস্ট পার্টি* বা *কমিউনিস্ট ইসতেহারে* (১৮৪৮) এই লুম্পেনদেরকে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে এক 'ঘুষখোর যন্ত্র' বলে চিহ্নিত করেছিল। ম্যানিফেস্টোতে মার্কস ও এঙ্গেলস একমাত্র প্রলেতারিয়াত (কারখানা শ্রমিক)-কে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সবথেকে বিপ্লবী শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। অন্যদিকে পুঁজিপতি ও প্রলেতারিয়াতের মাঝে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে কিছু বিভাজনকে মার্কস ও এঙ্গেলস চিহ্নিত করেছিল যেমন নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি, ছোটো কারখানামালিক, দোকানদার, বিভিন্ন প্রকারের শিল্পী এবং কৃষক। মার্কস তাঁর লেখা, *অষ্টাদশ লুই নেপোলিয়ানে* (The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, ১৮৫২), এক জায়গায় কৃষকদের তাচ্ছিল্যভরে 'আলুর বস্তার' সঙ্গে তুলনা করলেও খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখিয়েছিলেন যে ভবিষ্যত বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে, ছোটো কৃষকরা কীভাবে প্রলেতারিয়াতের সম্ভাবনাময় মিত্র হিসেবে গণ্য হতে পারে। সেই বিশ্লেষণকে মাথায় রেখে এবং বাস্তব রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে অনুধাবন করে বহু দেশেই বামপন্থীরা, শ্রমিক এবং কৃষকের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা বার বার বলেছেন। যৌথভাবে শ্রমিক কৃষকদের দাবি একইসঙ্গে তোলা হয়েছে। এটাও মনে রাখা দরকার যে পরবর্তীকালে ভদ্রলোকি মার্কসবাদী রাজনীতি, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষকে দূরে না সরিয়ে বামপন্থী আন্দোলনে শরিক করার চেষ্টা করেছিল। আমাদের দেশের সবথেকে বড়ো কমিউনিস্ট পার্টিও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের অন্যতম অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। মধ্যবিত্তকে ১৮৪৮ সালের ম্যানিফেস্টোর মতো 'রক্ষণশীল' ও 'প্রতিক্রিয়াশীল' হিসেবে চিহ্নিত করে না। সেদিক থেকে বলতে গেলে, লুম্পেনদের সম্পর্কে মৌলিক ও নতুন উদ্ভাবনী চিন্তার খামতি আছে বামপন্থীদের মধ্যে।

মার্কস তাঁর লেখা, *ফ্রান্সে শ্রেণি সংগ্রাম* (*The Class Struggles in France*, 1850)-এ উল্লেখ করেছিলেন যে অভিজাততান্ত্রিক মূলধনপুঁজির উপার্জন এবং আমোদ করার ধরনধারণ আর কিছুই নয় বরং উচ্চ বুর্জোয়া সমাজে লুম্পেন প্রলেতারিয়াতের নবজন্ম। মার্কস তাঁর এই লেখায় প্রলেতারিয়াত (কারখানা শ্রমিক) আর লুম্পেন প্রলেতারিয়াতের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য করছেন। তিনি বলছেন যে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধী, চোর, ভবঘুরে, যাদের কোনো নির্দিষ্ট কাজ নেই এবং যারা সমাজের ছোটো টুকরোর মতো বেঁচে থাকে তারা তাদের 'লাজারণী' চরিত্র ছাড়তে পারে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপে যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ ও বিপ্লব হয়েছিল সেগুলোকে ঠেকাতে উদার ও গণতান্ত্রিক মানুষের উপরে এই 'লাজারণী' নামক এক প্রকারের রাস্তার মানুষকে প্রতিক্রিয়াশীল ও রাজতন্ত্রের পক্ষের শক্তি ব্যবহার করেছিল। মার্কস, 'অষ্টাদশ লুই নেপোলিয়ানে', লুম্পেন প্রলেতারিয়াত বলতে বুঝিয়েছিলেন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে থাকা কিছু পেশা ও গোত্রকে যেমন জেলছুট কয়েদি, পকেটমার, ভিক্ষুক, জুয়াড়ি, ছাড়া পাওয়া সৈনিক, জঞ্জাল পরিষ্কারক, আর্থিক প্রতারক, পতিতালয় রক্ষার্থী, মুটে, দারোয়ান, বিদ্বৎসমাজ ইত্যাদি যাকে ফরাসীরা *ল্য বোহেমে* (*La Boheme*) বা বোহেমিয়ান মানুষ বলে চিহ্নিত করে। এরা কিন্তু সংরক্ষিত শ্রমিক সৈন্য থেকে আলাদা। কারণ সংরক্ষিত শ্রমিক সৈন্য পুঁজিবাদের কাঠামোগত বেকারত্বের মধ্যে পড়ে। আজ যারা বেকার কাল তারা অন্য কোনো কারখানায় কাজ পেলেও পেতে পারে। কিন্তু লুম্পেন প্রলেতারিয়াত সরাসরি পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এবং সরাসরি পুঁজিপতির দ্বারা শোষিত হয় না। তাই রাষ্ট্র ও আইনের বিরুদ্ধে তার অবস্থান থাকা সত্ত্বেও সে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়ার মতো জায়গায় থাকে না। বরং মার্কস দেখিয়েছেন যে কীভাবে লুম্পেন প্রলেতারিয়াত ঐতিহাসিকভাবে বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে মার্কসের ব্যাখ্যায় ইতিহাস শুধু শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস নয়। ইতিহাস হল উৎপাদনকর্মের ইতিহাস (History of Production)। যারা উৎপাদনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থেকে পরপোজীবী হয়ে বাঁচে তারা মার্কসের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হতে পারে না।

লুম্পেনদের সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রায় অচ্ছুতমার্কা ধারণার বিপরীতে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ফ্রানৎজ ফ্যানন তাঁর বই, *দ্য রেচেদ অফ দ্য আর্থ* (*The Wretched of the Earth*, 1961)-এ, লুম্পেন প্রলেতারিয়াতকে ঔপনিবেশিক বিরোধী বিপ্লবে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে দেখেছিলেন। সেদিক থেকে ফ্যাননের মতামত অনেকটা মার্কসের সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব, রাশিয়ার নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী মিখাইল বাকুনিনের প্রথম জীবনের বক্তব্যর

মতো। বাকুনিন প্রথম জীবনে দস্যু, অপরাধী ও ঘাতকদের মধ্যে বিপ্লবী স্পৃহার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রগতিশীল মানুষ লুম্পেন শ্রেণির একাংশকে শঠ পথ ছেড়ে সৎ পথে আসার নৈতিক আহ্বানও জানাতে পারেন। সেই আহ্বানের শিক্ষা কিন্তু মার্কসবাদী সাহিত্যে পাওয়া যাবে না। বরং সেই শিক্ষা একজন প্রগতিশীল চিত্রপরিচালক, সাইদ আখতার মির্জার অসাধারণ ছবি *সেলিম লাংড়ে পে মৎ রো* থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে। মির্জা সাহেবকে বম্বে শহরে বসে তাঁর জীবনের আশে-পাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে মাথায় রেখে সিনেমা বানাতে হয়। তাই তাঁর সিনেমায় বম্বে শহরে একদিকে যেমন কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বেকার শ্রমিকদের জীবন ধরা পড়ে আবার বেকারদের ছেলেদের মধ্য থেকে উঠে আসা এক নতুন লুম্পেনগোষ্ঠীর চিত্র ফুটে ওঠে। এই লুম্পেন, মুম্বাইয়ের অনেক হিন্দি ফিল্মে হয় নায়ক অথবা খলনায়কের ভূমিকায় দেখা যায়। যেমন, *দিওয়ার, তেজাব, পরিন্দা, অগ্নিপথ, সত্য, সিটি অফ গোল্ড, ওয়ানস আপন আ টাইম ইন মুম্বাই* ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটা সিনেমায় হয় রাষ্ট্রের আইনের কাছে বেআইনি লুম্পেন ব্যক্তিত্ব হার মানবে এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র জয়ী হবে অথবা লুম্পেন, অন্য গুণ্ডা মস্তানদের হাতে প্রাণ দেবে। লুম্পেনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অপকর্ম ও অসামাজিক কাজকে ধিক্কার জানানোই এইসব সিনেমার এক অতি সরলীকৃত প্রয়াস। কিন্তু মির্জা সাহেব *সেলিম লাংড়ে পে মৎ রো*-তে একটা অন্য সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে পুরোনো শত্রুতার জন্য সেলিমের মতো লুম্পেন শেষ পর্যন্ত অন্য লুম্পেনের হাতে মারা যাচ্ছে। কিন্তু সে মারা যাওয়ার আগে লুম্পেনগিরি ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। কারণ তার ভগ্নিপতি আসলাম, যিনি একজন প্রগতিশীল মুসলিম যুবক (যিনি মুসলিম নারী শিক্ষার দাবিতে রক্ষণশীল মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়েন, যিনি সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে অশিক্ষা দূর করার কথা বলেন, যিনি ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন, যিনি ধর্মের নামে দেশভাগকে একটা দুর্ঘটনা বলে মনে করেন)—তিনি সেলিম কেসদুপদেশের সাহায্যে অপরাধ জগৎ ছাড়ার জন্য প্রভাবিত করেছিলেন। ওই সিনেমায় আসলামের চরিত্র আসলে এক আদর্শ প্রগতিশীল মানুষের প্রতীক। সাইদ মির্জার *সেলিম লাংড়ে মে মৎ রো* থেকে শিক্ষা নিয়ে লুম্পেন শ্রেণির একাংশকে কি বলা যায় না যে সত্যতার পথে হয়তো চটজলদি পয়সা উপার্জন হবে না কিন্তু বেআইনি ও অসামাজিক কাজ-কারবার ছেড়ে ভালো, সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করে মাথা তুলে দাঁড়ানোর মধ্যে এক অপরিসীম আনন্দ ও সম্মান আছে।

নিতান্ত অনিবার্যতায় এ সংখ্যায় কোনো পুস্তক সমালোচনা মুদ্রণ করা সম্ভব হল না। আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদকমণ্ডলী

আরেক রকম

চতুর্থ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা
১৬-৩১ মার্চ ২০১৬ ১-১৫ চৈত্র ১৪২২

আগামী পাঁচ বছরের সংকল্প । গরিবের মাথায় মস্ত টুপি । সমাজমনের আরশি । ব্রিটেন বনাম ইউরোপ । পথের দাবি । জনদরদী! এর চেয়ে হাসির কথা আর কী হতে পারে? । হস্তিদর্শন । মেয়েদিবসের গানে গানে... । বিশ্ববিদ্যালয় সাম্প্রতিকী । অনধিকারের কড়ি: অধিকারের বাঘ । ধর্ম অধর্ম । দালির নার্সিসাস । শঙ্খ চৌধুরী । বিদ্যালয় শিক্ষায় জনস্বাস্থ্যের প্রভাব । লুম্পেনকথা । ভাই, কাল কী করছেন?

মূল্য : ২০ টাকা